Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ছোটগল্প, এই সময়

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.2
Pages	30-42
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা ছোটগল্প, এই সময়

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের যে রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন সে পথে গত একশ বছরে কখনই পদাতিকের অভাব হয়নি। তবু স্বৈরবৃত্ত কাল ও পরিবর্তমান জগতে বাংলা ছোটগল্পের পালাবদল ঘটে বারেবারেই। এই পালাবদলের কথা লিখেছিলাম *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের নব্বুই বছর ১৮৯১–১৯৮০* (১৯৮২) গ্রন্থে। কিন্তু গত দশ–বারো বছরে গল্পের স্রোত বহে চলেছে, নতুন নতুন বাঁক দেখা দিয়েছে সেই প্রবাহে, ভেসে উঠেছে জীবনের নতুন চর, শোনা গেছে নতুন মানুষের কণ্ঠস্বর। আজ আর বাংলা ছোটগল্পের প্রেরণাদাতা রবীন্দ্রনাথ নন, যদিও তিনি গঙ্গোত্রী। তাঁর গল্প থেকেই বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু, তবু সেই প্রথম প্রেরণাদাতার শরণ ছেড়ে বাংলা গল্প অনেকদূর এগিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-ত্রৈলোক্যনাথ-প্রভাতকুমার-প্রমথ চৌধুরী পেরিয়ে বাংলা ছোটগল্পের স্রোত চলেছে নতুন পথে। তারাশংকর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম আর কল্লোল গোষ্ঠী, প্রবাসী-ভারতবর্ষ-বিচিত্রা-শনিবারের চিঠি গোষ্ঠী পেরিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বসমরকালে বাংলা গল্প বিচিত্র বাঁক নিয়েছে। এক ঝাঁক নতুন গল্প লেখক এসেছিলেন—নারায়ণ-নরেন্দ্রনাথ-সন্তোষকুমার-সমরেশ-জ্যোতিরিন্দ্র-রমাপদ বিমল-কর-নবেন্দু-ননী ভৌমিক-সুশীল জানা-বারীন্দ্রনাথ দাস, প্রাণতোষ ঘটকেরা। পরেপরেই এসেছিলেন সুবোধ ঘোষ–জগদীশ গুপ্ত–গজেন্দ্র মিত্র–সুমথ ঘোষ–আশাপূর্ণা দেবীরা। আর এসেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর সহযাত্রী জগদীশ গুপ্ত আর সুবোধ ঘোষ। এই তিন গল্প লেখকই প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা, রহস্যময়তা, স্ববিরোধিতা, তাকে জানতে চেয়েছিলেন। গল্পকার হিসেবে তাঁরা কল্লোল-গোষ্ঠী বহির্ভূত। তাঁরা চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতশূন্য, আবেগ বিষয়ে নির্বিকার; শিল্পী হিসেবে নিরাসক্ত, পরিবেশ–সচেতন, বিজ্ঞানবুদ্ধি-সচেতন।

তিনজনেই তাৎক্ষণিক থেকে চিরায়ত, সমস্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষের অন্তরালে জটিলতার আবিষ্কারে ও তার স্বরূপসন্ধানে ব্যগ্র। বস্তুত, এঁরা তিনজনে এই শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের তরুণ প্রজন্মের ছোটগল্প লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। এঁদের ঈষৎ পরে এসেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী, বাণী রায়, মহাশ্বেতা দেবী। এঁদেরই সঙ্গে এলেন কমলকুমার মজুমদার আর অমিয়ভূষণ মজুমদার।

তাঁদের পথ ধরে এসেছেন যে তরুণ প্রজন্ম , তাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা কীভাবে ও কতোটা প্রভাবিত, সে সম্পর্কে একালের বরিষ্ঠ প্রয়াত গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষের অভিমত অনুধাবনযোগ্য।—

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আসল ব্যাপার হল, তাঁর নিজের চোখ। একেবারে জ্বলজ্বলে, ড্যাবডেবে এক জোড়া চোখ। বোধহয় তার রঞ্জনরশ্মিও ছিল। এমন আনকোরা নতুন চোখে জীবনকে তাঁর আগে কেউ দীর্ঘকাল দেখেননি। আমাদের সমাজ, পরিবার, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস সবকিছু দেখার ধরনে আগাপাছতলা বদ্‌লে গেল। বিনা প্রশ্নে কোন মূল্যই আমরা আর গ্রহণ করিনি। সব ঘষে ঘষে যাচাই করে তবে রাখা আর না রাখা। অনেক কিছু যে অচল, তখন থেকেই ঠিক এতটা ডাহাভাবে বোঝা গেল। প্রথম বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর ওই চোখ দুটো দিয়ে। বল্‌তে কী আমার মনে হয়, মানিকের পর বাংলা সাহিত্যে শরীর বদ্‌লছে। সাজগোজ ঘটেছে অনেক কিছু। কিন্তু ওই দুটি চোখ? তারপর নতুন চোখ এল না, এখনও আসেনি।
>
> ['অনিষ্ট।' ১৩৭৮ মাঘ সংখ্যা।]

স্বাধীনতার পরে যে তরুণ প্রজন্মের লেখকরা ছোটগল্পের আসরে দেখা দিয়েছেন। তাঁদের জন্মের পূর্বসীমা ১৯৩০ খ্রী. উত্তর সীমা ১৯৪০ খ্রি. তাঁদের মধ্যে আছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, লোকনাথ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, সমরেশ মজুমদার, সমরেশ দাশগুপ্ত, সমীর রক্ষিত, অভ্র রায়, রমানাথ রায় এবং আরো অনেকে। জীবনের গভীরে ও বাহিরে তাঁরা সন্ধান করেছেন নতুন মহাদেশ। মানুষ নামক যে জীবটি নিজের সৃষ্ট জটিলতার শিকার, তাকে বারবার তাঁরা দেখেছেন, আবার মানুষের উপরে পরিবেশের অমোঘ প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন।

এই প্রজন্মের গল্প লেখকদের বয়স আজ পঞ্চাশ পেরিয়েছে। তাঁরা অভিজ্ঞতায় ও শিল্পরূপায়ণে হয়েছেন সমৃদ্ধ। আজ আর শীর্ষেন্দু-সুনীল-মতি

নন্দীদেরকে নবীন গল্পলেখক বলা যায় না। স্বীকার্য এঁরা আগেকার কিছুই দেখেননি, কোনও উত্তরাধিকারের কৃতজ্ঞতা বা স্মৃতি থেকে বিচ্যুত। এঁরা জন্ম নিতে বা বাড়তে থাকলেন ব্ল্যাক-আউটে, দুর্ভিক্ষে, দাঙ্গায়, রক্তাক্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে, উদ্বাস্তু কলোনিগুলির কিনারে বা বাইরে। পূর্বতন গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের দৃষ্টিতে এঁরা নতুন ব্লাড-গ্রুপ। পূর্বেকার লেখকদের সঙ্গে নেই কোনো আত্মীয়তা। এঁরা যখন বড় হতে শুরু করেছেন যৌথ জীবনের সৌম্য সৌধ ততদিনে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, শ্রদ্ধা ভক্তি এসব খালি শেখানো কথা। নারী পুরুষের সম্পর্ক অন্যরকম। অর্থাৎ মৌল তাগিদগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু পুরানো কোনও মায়াবী স্মৃতি নেই। বৈরী বিশ্বে বাস করার জন্য তাঁরা তৈরি হচ্ছেন, কখনো একজোট হয়ে, বা হবার ভান করে। আসলে এঁরা আরো বেশি নিঃসঙ্গ, একা, কিছু না হলেও ক্ষুব্ধ সততই, প্রতিকার খুঁজছেন অশেষ বিকারে, নতুবাস্নায়ুজ্বরে।

তরুণ গল্প লেখকদের এই দল দেখেছেন পরবর্তী প্রজন্মের এক গল্পলেখক। (দ্র. সন্তোষকুমার ঘোষের ভূমিকা— মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় , শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প)।

মনে হবে, দ্বিতীয় বিশ্বসমরকালীন গল্প লেখকদের (যাঁদের অন্যতম এই ভূমিকার লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ) সঙ্গে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের এইসব গল্প লেখকের স্পষ্ট ব্যবধান আছে। ব্যবধান কেবল মানসিকতায় নয়, ভাষায় ও আঙ্গিকে; কেবল জীবন দৃষ্টিতে নয়, জীবনের নানা উপকরণের অভিনব ব্যবহারে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'একটি প্রেমের গল্প' 'দোলা' 'রস' 'সেতার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাণ্ডারী' 'পুষ্করা,' রমপদ চৌধুরীর 'জ্বালাহর', 'আমি আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', 'দিনকাল' 'ভারতবর্ষ', সমরেশ বসুর 'জোয়ার ভাঁটা', 'আদাব' 'ছেঁড়া তমসুক, 'আলোর বৃত্তে', সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি', 'শোক', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'বৈয়াকরণ' 'বাহাত্তুরে', সুবোধ ঘোষের 'কালগুরু' 'গরল অমিয় ভেল' 'গোত্রান্তর' 'জতুগৃহ' 'ঠগিনী' ফসিল' বিমল করের 'সুধাময়', 'নিষাদ' 'আত্মজা' 'অশ্বত্থ' গৌরকিশোর ঘোষের 'জবানবন্দী', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' 'বনের রাজা', নবেন্দু ঘোষের 'বাঁকা তলোয়ার', ননী ভৌমিকের 'ধানকানা' সুশীল জানার 'আম্মা', বারীন্দ্রনাথ দাসের 'ফুটপাথ', শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাটি', বিষুবরেখা', 'জেগুয়ার' প্রভৃতি গল্পের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'খরা', 'প্রতিশোধের একদিক, শীর্ষেন্দু

মুখোপাধ্যায়ের 'আমরা' 'পটুয়া নিবারণ' 'বিষাদ সিন্ধু' ক্রীড়াভূমি,' 'আমাকে দেখুন'; মতি নন্দীর 'বয়সোচিত' 'শহরের আসা' 'শেষ বিকেলের দুটি মুখ', দেবেশ রায়ের 'গোপাল এবং কলকাতা' 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা,' আনন্দ বাগচীর 'মৃত্যু অমৃত', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফুল ফোটার গল্প', প্রফুল্ল রায়ের 'বাঘ' 'রাজা যায় রাজা আসে,' 'সন্ধ্যাকলি', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পরী', 'হাজরা নসকরের যাত্রাসঙ্গী', দিবেন্দু পালিতের 'মাছ' 'দুঃসময়,' 'দাঁত', 'তপোবিজয় ঘোষের 'একটি মত্তানী গল্পের ভূমিকা, 'ঘ্রাণ' ঘাতক', শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'নেশা' 'খেলাঘর' 'পাশফেরা', মহাশ্বেতা দেবীর 'সাঁঝ সকালের মা', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মৎসভেদ' 'রায়' 'কালবীজ' গল্পগুলি রাখলে অনুধাবন করা যায়, আমরা অন্য ধরনের অনুভূতি ও জীবনবোধে, অভিজ্ঞতা ও রসাবেদনে উপনীত। মনে হয় এই দুই প্রজন্মের গল্পলেখকরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। জীবনে আনন্দ ও মানবিক মূল্যবোধে যে আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল তার বদল ঘটেছে। সমাজজীবনের সমস্ত চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা, মানস অস্বস্তি ও বিমূঢ়তা, অতর্কিত জৈব প্রতিক্রিয়া ও অনাকাঙ্ক্ষিত স্নায়ু-চাপ ব্যক্তিকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে এবং ছোটগল্পে তার নির্ভুল প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

ষাট, সত্তর ও আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক জীবনের যেমন অস্থিরতা ও বিপর্যয় দেখা গেছে, তেমনি শিল্পে-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য। ছোটগল্পের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আন্দোলনে এই সবকিছুরই নির্ভুল প্রতিচ্ছবি পড়েছে। ১৯৬৭ সালে নকসালবাড়িতে যে সশস্ত্র কৃষি-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা পরবর্তী এক দশক ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসারূপে দেখা দিয়েছে। এই রাজনৈতিক আন্দোলন আপাতত পরাজিত, কিন্তু নির্মূল নয়। অন্যদিকে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পশ্চিবঙ্গে পরিপূর্ণ সন্ত্রাস বিরাজ করেছে। এই দুটির প্রভাব কেবল সমাজে নয়, সাহিত্যে-শিল্পে দেখা গেছে।

পঞ্চাশের দশকের শেষে ষাটের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পে নতুন আন্দোলন দেখা গেল, যার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হল 'ছোটগল্প, নতুন রীতি'। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিমল কর। যিনি বয়সের দিক থেকে তরুণ নন। সেদিন তরুণদের একটি গদ্য-সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন বিমল কর এবং তার ভূমিকায় এই আন্দোলন সম্পর্কিত সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছিলেন। সেদিনের তরুণ লেখকরা বহির্মুখীন না হয়ে আন্তর্মুখীন হতে চেয়েছিলেন। সেকারণে তাঁদের গল্পে স্ব-কৃত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছিল বারবার,

পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির আভাস আর চেতনামগ্ন ভাবপ্রবাহে তির্যক বা বিকৃতভাবে, প্রকাশিত হচ্ছিল সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলী। বাংলা ছোটগল্পে ধারা-বদলের এই সূচনা হয়েছিল বিমল করের গল্পে। তাঁর 'সোপান' 'জননী' 'অপেক্ষা' 'সুধাময়' গল্পে এই পালাবদলের শিল্পরূপ লক্ষ্য করি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আর দিবেন্দু পালিতের গল্পে আত্মজৈবনিক পদ্ধতির অনুসৃতি অনায়াসলক্ষণীয়। অন্যদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে লক্ষ্য করা যায় প্রবল জীবনীশক্তি। শীর্ষেন্দুর 'আমাকে দেখুন', দিব্যেন্দুর 'দাঁত', সুনীলের 'প্রতিশোধের এক দিক' গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

ষাটের দশকে তরুণতর গল্প লেখকরা যে নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত করে, তাকে বলা হয়েছে 'শুদ্ধ গল্প' 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প'। তাঁদের পক্ষে চমকপ্রদ ঘোষণায় জানানো হয়েছে— 'ছোটগল্পের ভাষায় আমূল পরিবর্তন আনছেন ষাট দশকের ছোটগল্প লেখকরা। এই লেখকগণ পৃথক পৃথকভাবে এবং যুক্তভাবে ছোটগল্প সম্পর্কে নতুন চিন্তার অবতারণার দ্বারা নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটাচ্ছেন বা ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। গল্পের কাঠামো ভেঙে দিয়েছেন ব্যক্তকরণের ক্ষমতার দ্বারা। ব্যক্তকরণের ভাষাও আসছে অনুরূপভাবে। ছোটগল্প থেকে কাহিনী ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। তার কাহিনী নিজস্ব ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে পুরনো ছোটগল্পে যেখানে কাহিনীর ভাষায় গল্পের ভাষায় অন্তরীণ ছিল, কাহিনী বিলুপ্ত হওয়ার জন্যে ছোটগল্পে গল্পের ভাষা মুক্তি পাচ্ছে। আন্তরজীবনের অভিব্যক্তিকে যেভাবেই প্রকাশ করা হচ্ছে সেভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে গল্পের ভাষা।" (শোভন রায়ের নিবন্ধ 'ছোটগল্প ও ভাষা', 'ক্রান্তিক' সংকলন শ্রাবণ ১৩৭৫/১৯৬৮)।

বিদ্রোহী গল্পলেখকদের এই চমকপ্রদ ঘোষণা কিন্তু শিল্পসাফল্যে উত্তীর্ণ হয়নি। স্বীকার্য এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। এই দশক (১৯৬৬) 'ঈগল', 'স্বরান্তর', ক্রান্তিক', শিল্পীচক্র' 'প্রত্যয়', আত্মপ্রকাশ' প্রমুখ লিটল-ম্যাগাজিনের স্পর্ধিত ঘোষণা বাংলা ছোটগল্পে পালাবদল ঘটাতে পারেনি।

বরং ষাট-সত্তর-আশির দশকে রাজ্যব্যাপী সন্ত্রাসের পটভূমিতে উঠে এসেছে রাজনৈতিক চেতনাঋদ্ধ ছোটগল্প। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল তার ফলে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের দরজাগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তৎকালে রচিত গল্প এক ধরনের আন্তরালসৃষ্টির প্রয়াস অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৭৭-পরবর্তী সময়ে গল্পলেখকরা ফিরে পেয়েছিলেন তাঁদের স্বাধীনতা। ফলে এই অন্তরাল উঠে যায়। 'সারস্বত'

'চতুষ্কোণ' 'নন্দন' 'উত্তরযুগ' 'সত্যযুগ' 'মাসিক বাংলাদেশ', 'পরিচয়' ও 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকায় রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন গল্প প্রকাশিত হয়। এই ধরনের গল্পে শিল্পসাফল্য কিন্তু খুব একটা বেশী নয়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপোবিজয় ঘোষ, দেবেশ রায়, চিত্ত ঘোষাল, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মনি মুখোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, হীরালাল চক্রবর্তী, শৈলেন চৌধুরী, বারিদবরণ চক্রবর্তীর মতো 'কমিটেড' শিল্পীরা এধরনের ছোটগল্প লিখছেন। এঁদেরই পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনাঋদ্ধ ছোটগল্প লিখেছেন ও লিখছেন প্রফুল্ল রায়, আফসার আমেদ, অসীম রায়, গুণময় মান্না, সমরেশ বসু, সতীনাথ ভাদুরী, মহাশ্বেতা দেবী।

এই সময় বলতে কোন সময়টাকে বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় আমাদের বেশ সময় স্বৈরবৃত্ত, দ্রুত পরিবর্তনশীল। বিগত পনের, বিশ বা পঁচিশ বছর— আমাদের চেনাকাল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক অস্থিরতা আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তেই ধ্বস্ত করছে। কোনো শান্ত প্রতিষ্ঠাভূমিতে আমরা আজ দাঁড়িয়ে নেই, কোনো স্থির মূল্যবোধে আমাদের আশ্রয় নেই। রাজনীতি সম্পর্কে বিমুখ সাধারণ মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়েছে। রাজনীতি ও প্রশাসন তেমনি তাদেরকে নানাভাবে ত্রস্ত করেছে। রাজনীতি সম্পর্কে গল্পলেখকদের মানসিকতা এক স্তরের নয়। তা বহুস্তরব্যাপ্ত। তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুবোধ ঘোষ, রমেশ সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে রাজনীতি যেমনভাবে মুখ্য উপজীব্য হয়ে উঠেছিল, আমাদের চেনা সময়ে সে রূপ দেখা যায় না। মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, দেবশ রায় বা অমলেন্দু চক্রবর্তী যেভাবে গল্পে ও জীবনে রাজনীতিকে দেখেছেন, এই সময়ের তরুণতর গল্পলেখকরা সেভাবে দেখেন না। রাজনীতি-আশ্রয়ী গল্প লেখার প্রবণতা এই সময়ের অনেক গল্পকারের আছে। নকশাল আন্দোলন আর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেমন এক নয়, রাজনীতি–আশ্রয়ী গল্পও তেমন এক ধরনের নয়। শৈবাল মিত্র, অমর মিত্র, আবুল বাশার, আফসার আমেদ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, জয়ন্ত জোয়াদ্দার। তপোবিজয় ঘোষের ছোটগল্পে রাজনীতির অন্যরূপও আমরা দেখছি। লেখকদের প্রতিভা বা শিল্পসামর্থ্য এবং অবস্থানগত স্তরবিন্যাসে রয়েছে নানা ব্যবধান। কোনো গল্পলেখকের উপর ঐতিহ্যের চাপ বেশি, কারুর উপরে সাময়িক ঘটনার চাপ বেশী, কারুর উপর সামাজিক ও অর্থনীতিক বিকারের প্রতিক্রিয়া বেশি, কারুর উপর সাময়িক থেকে পলায়নের প্রবণতা বেশি। এখনো তো ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে গঠিত পরিবার-জীবন ও সমাজ-জীবন। আর তা থেকেই ঘটেছে ব্যক্তির অসম্মান, নারীর অবমূল্যায়ন। মূল্যবোধের অনাদর। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান ধারণা, অভ্যাস সংস্কার আজো আমাদের পরিচিত সমাজভুক্ত মানুষকে চালায়। তার ফলে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে আত্মপ্রতারণার নানা রূপ দেখতে পাই। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-মমতা সহমর্মিতা সেকারণে পায়না সহজ স্ফূর্তি, ঘুটেনা জীবনের মহৎ বিকাশ।

এইসব কিছু নিয়েই এই সময়ের ছোটগল্প। রাজনীতি-আশ্রয়ী আর রাজনীতি-কেন্দ্রিক জীবনদৃষ্টি, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে আপোষহীন বা আপোষকামী মানসিকতা, পুরনো ঐতিহ্যবোধ-আশ্রয়ী জীবনভাবনা আর ইতিহাসের অমোঘ ধারণায় শ্রেণী সংগ্রামের প্রেক্ষিতে শুদ্ধ জীবনবোধে উত্তরণের প্রয়াস: এই সবকিছুই এই সময়ের ছোটগল্পে রূপায়িত।

এই সময়ের গল্পে অনেক কিছু তারিফ করার মতো, আবার অনেক কিছুই ঘাটতি আছে। যেমন, দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করছে যে দুটি প্রধান গোষ্ঠী— হিন্দু আর মুসলমান, তাদেরকে নিয়ে লেখা গল্পে ঘাটতি আছে। দুটি সমাজ, দুটি ধর্ম, দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধানটা কোথায়, কী করলে এই ব্যবধান উত্তীর্ণ হওয়া যায়— এ নিয়ে সচেতনতা এই সময়ের ছোটগল্পে তেমন পাই না। অথচ তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্যকুমার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু মুসলমান সমাজ ও চরিত্র নিয়ে লিখেছিলেন সার্থক গল্প। আজ সেই সার্থকতা খুঁজলে দেখা যাবে, জীবনবাদী অনেক গল্পকার পিছিয়ে পড়েছেন। দেশবিভাগের অব্যবহিত আগে-পরে সদ্য-উদ্ভূত হিন্দু লেখকদের পাশাপাশি উঠে এসেছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মবিন উদ্দিন আহমদ, শওকত ওসমান। আজ আমাদের চেনা পরিবেশে মুসলমান সমাজকে নিয়ে সার্থক গল্প লিখেছেন আব্দুল জব্বার, আফসার আমেদ, আবুল বাশার। আর সব লেখক এই ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

এই সময়ের গল্পলেখকরা সমাজ-সচেতন, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে স্তর-বিন্যাস। ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকের শুরুতে যে তরুণ গল্পলেখকরা এলেন, তাঁদের সকলের গল্পেই সর্বহারা শ্রেণী, শোষিত শ্রেণীকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে, একথা বললে অতিসরলীকরণের দায়ে পড়তে হয়। যে গল্পের লেখক ও পাঠক মূলত উঠে আসে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে, তারা কতটা শ্রেণীচেতনামুক্ত হতে পারে, তাতে সন্দহ থেকেই যায়। ব্যক্তির শ্রেণীরূপ আর ব্যক্তিরূপের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার সন্ধানে সব গল্পকারই আগ্রহী, এমন কথাও বলা যায় না। হয়ত তার সূচনা সমরেশ বসুর গল্পে, তবে আমাদের দেশকালে

রাজনীতিসচেতন শ্রেণী-সচেতন কুশলী গল্পকারদের দেখা পাওয়া যায়। দেবেশ তোয়েব 'সাত হাটের হাটুরে' গল্পে আমরা দেখি পানবিড়ি-বিক্রেতা একটি তের বছরের বালক সাধনের দিনযাপনের বিবরণ। নিখুঁত অনুপুঙ্খ বিবরণে ধরা পড়ে বালকটির শ্রেণীগত রূপ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে চরিত্রের শ্রেণী-রূপের সঙ্গে দেখা গেছে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া। 'জটায়ু' গল্পের নিত্যচরণ আর 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পের কাঞ্চন তার উদাহরণ। তবে সবসময় ব্যক্তির শ্রেণীরূপ আর ব্যক্তিত্বের সফল শিল্পরূপায়ণ ঘটেনা। আফসার আমেদের 'পাথর, পাথর' গল্পে রূপো আর আলতা নামের দুটি নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণের চিত্রকে ছাপিয়ে গেছে পরিবেশের অলঙ্ঘ্যকঠোর বৃত্তান্ত। তাপোবিজয় ঘোষের গল্পে এই ধারার সফল নমুনা পাই। 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা', 'ক্ষুৎকোতর', 'সীতানাথের বাজার', 'শোভণের জন্য বিজ্ঞাপন' প্রমুখ গল্পে লেখকের রাজনীতিসচেতনতা ও মাত্রাবোধের পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। নিম্নমধ্যবিত্ত সীতানাথ কর্মজীবনের শেষে যখন মৃত্যু ছাড়া আর কারুরই প্রতীক্ষা করতে ভুলে গিয়েছে তখনো ক্ষুধা বা লোভ তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। 'সীতানাথের বাজার' গল্পে এই বিষয়টিকে লেখক অনুপুঙ্খবিবরণের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন :

> আর আচ্ছন্ন সীতানাথ গন্ধ পাচ্ছেন, যেন অনেক দূরে কোথাও কচি কলাপাতায় সরষেবাটা-মাখা ইলিশভাতে সেদ্ধ হচ্ছে। ঝোল থেকে উঠছে সোনামুখী কাঁচালঙ্কার গন্ধ। চমৎকার সেই গন্ধে জিভে জল এসে গেল সীতানাথের। বার কয়েক ঢোঁক গিলে তিনি তাকালেন ও পাশে।

ব্যক্তিরূপ ও ব্যক্তিত্ব, দুয়ের মিশ্রণে নির্মিত এক সফল ছোটগল্পের উদাহরণ এটি। লেখক সীতানাথকে পুরোপুরি উন্মোচিত করেছেন।

এই সফল উন্মোচনের আর এক উদাহরণ মহাশ্বেতা দেবীর অসামান্য গল্প 'সাঁঝ সকালের মা' (১৯৭০) মা ও ছেলে, জটি ঠাকুরনী আর তার ছেলে সাধন কান্দোরীকে নিয়ে গল্প। 'কেমন করে গর্ভধারিণী মা সাঁঝ সকালের মা হয়ে গেল সে এক আশ্চর্য বৃত্তান্ত।"

পাঁচ বচরের ছেলে সাধনকে নিয়ে সদ্য বিধবা জটি কোথায় যায়? পাখমারা সম্প্রদায়ের উপেন কান্দোরীর সঙ্গে জটি ঘর বেঁধেছিল, কিন্তু সে তো হঠাৎ মারা গেল। এ বিপুল ভুবনে জটি যায় কোথায়? অনেক ভেবেচিন্তে হল জটি ঠাকুরনী। অলৌকিকতা দিয়ে নিজের চারদিকে বর্ম না আঁটলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, একথা জটি বুঝেছিল। মায়ে ছেলেতে কথা হয়—

'সাঝে আর সকালে তু মা। আর দিনমানে তু ঠাকুরণী।'

'হ্যাঁ বাপো। আমি তোর সাঁঝ সকালের মা।'

জটির কাছে সারাদিন প্রার্থী ও ভক্তের ভিড়। জটি পয়সা নয়, কড়ি নয়, শুধু একবাটি চাল নিত। নিজে না খেয়ে ছেলেকে খাওয়াত। না খেয়ে খেয়ে জটি মরল, ছেলে শ্রাদ্ধ করল। কালীঘাটে পুরুতকে মূল্য ধরে দিয়ে জটির শ্রাদ্ধ করল তিরিশ বছরের নির্বোধ ছেলে সাধন। শ্রাদ্ধের চাল সে পুরুতকে ছাড়ল না।

বুকের কাছে চালের পোঁটলা। সাধন হেলে দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত রাঁধবে। ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যত দিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওর কাছে সাঁঝ সকালের মা বাঁধা থাকবে। মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।

সাধনের মায়ের প্রতি ভালবাসা আর তপ্ত ভাতের প্রতি আসক্তি, এ দুয়ে কোনো ব্যবধান নেই, ছেদ নেই। দুয়ে মিলে সাধন সম্পূর্ণ। তপ্ত ভাতের মধ্য দিয়ে সাধন তার মাকে বারবার ফিরে পায়। ব্যক্তির শ্রেণীরূপ আর ব্যক্তিত্ব, দুয়ের সফল মিশ্রণ ঘটেছে এখানে।

এই সময়ের— বিগত পঁচিশ বছরের কিংবা বলা উচিত, বিগত চল্লিশ বছরে— বাংলা সাহিত্যে দায়িত্বহীন রম্য গদ্যরচনার যেমন সমাদর দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় বিনোদনমূলক গল্পের সমাদর। যেখানে পাঠকের চারিত্র মধ্যবিত্ত চারিত্র, সেখানে আজাদী পরবর্তী সচ্ছল পাঠকের বিনোদনের চহিদা মেটাতে এক ধরনের ছোটগল্পের চাহিদা দেখা গেল। তেমন গল্প নবীনরাও লিখছেন।

তারই পাশাপাশি উঠে আসে মানবমুখীন ছোটগল্প। সমরেশ বসু 'অকালবসন্ত' গল্পে একদিন আমরা শুনেছিলাম চরম দারিদ্র, কুশ্রীতা আর গ্লানিভরা জীবনে ভরাযৌবন তিন বোনের জীবনে ঠোঙ্গা বানানো আর ঘুঁটে দেওয়ার জগতে একটি যুবককে কেন্দ্র করে তিন মানবীহৃদয়ে শঙ্খধ্বনি। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে বেকার যুবক যুবতীরা দুনিয়াতে সব কিছুকে হারিয়ে নিয়ে অশ্বমেধেব বিজয়ী ঘোড়ার মেজাজ ও গতিতে স্বপ্নময়তায় বাস্তবকে পরাস্ত করে। চিত্ত ঘোষালের 'তারকনাথের মোহর' গল্পে বাস্তব পরিস্থিতিতে মার খাওয়া দুটি যুবক-যুবতী জীবন-ধারণের অমোঘ প্রয়োজনে ধর্মের গণ্ডি ভেঙ্গে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। মনি

মুখোপাধ্যায়ের 'দখল' গল্পে এক আদিগন্ত শস্যময় প্রান্তরে এক ফসল আপ্লুত পুরুষের সামনে একদিন এলো এক নারী। মাঝখানে দণ্ডমুন্ডের কর্তারা।

> সামনে কালোবাবুদের তিনজন লাঠিয়াল, তার পিছনে ধানকাটারা। আর তারও পিছনে ভিড় করে আসে লোকালয়ের কৌতূহলী লোকেরা। তারা দেখে কাকতাড়ুয়ার মতো নেংটি পরা এক পাহারাদার বল্লম উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশে মেয়েমানুষটা। কালোবাবুদের তিন লাঠিয়াল এগিয়ে যেতে গিয়ে মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে এক অন্নময় প্রান্তর।

এই জীবনমুখিতার পরিচয় পাই শৈলেন চৌধুরীর 'ঘুণাক্ষর' গল্পে। খেয়াঘাটে দুটি যৌবন পরস্পরকে চিনে নেয়–

> দুএকজন যাত্রী আসতে শুরু করেছে, যারা দিনের প্রথম খিয়া ধরবে। ওরা খেয়াঘাটে পাড়ের উঁচুতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনে দুজনকে দেখল, কোনো কথা বলল না। শুধু থমকে যাওয়া সময়ের শব্দ শুনতে থাকল।

এই জীবনমুখিতার নানারূপ আমরা দেখি দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী', দেবেশ রায়ের 'কলকাতা ও গোপাল।' মতি নন্দীর 'উৎসবের ছায়ায়' সত্য গুপ্তের 'ঘোলা জল নোনা জল' প্রদ্যোৎ গুহের 'ভাত' গল্পে।

যে–সব তরুণ গল্পলেখক এই সময়ে অর্থাৎ গত পঁচিশ বছরে উঠে এসেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হীরালাল চক্রবর্তী, শৈলেন চৌধুরী, বারিদবরণ চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সমীরকুমার রায়, বাদল ঘোষ, দীপক রায় চৌধুরী, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্র, নবারুণ ভট্টাচার্য, প্রলয় শূর, বাণীব্রত চক্রবর্তী, ঝড়েশ্বর চট্টপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সমরেশ দাশগুপ্ত, অভিজিৎ সেন।

হীরালাল চক্রবর্তীর 'পথের ছবি' গল্পে ক্ষুধা আর কাম দুটি আদিম বৃত্তির জোড়কলমে জীবনের আশ্চর্য উদ্‌ভাসন। ভূষণ ভিমি উচ্ছিন্ন চাষী দম্পতি শহরের জীবিকার দায়ে লড়াই করে। রোগজর্জরিত ভূষণ ট্রেনে লজেন্স ফিরি করে, হাত ধরে তাকে ওঠায় নামায় ভিমি। আলাপ হয় হকার সহকর্মী রাহুর সঙ্গে, যে কালক্রমে হয়ে ওঠে ভূষণের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভিমি কি যুবক রাহুর সঙ্গে চলে যাবে— এই চিন্তায় ভেঙে পড়ে ভূষণ, তখন তার সেবা করে ভিমি। আবার রাহুর অতপ্ত সোহাগে ভিমির রক্ত চঞ্চল হয়। রাহু ভিমিকে নিয়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু শত অবজ্ঞার আড়ালেও ভিমির করুণামাখানো ভালবাসাই তো মড়ুঞ্চে ভূষণের প্রাণভোমরা। আততায়ী ভূমিকায় রাহু যখন মরীয়া, তখন ভিমির হুঙ্কার— 'খবরদার রাহু জ্যান্ত মানুষটাকে মারবি নি।'

শৈলেন চৌধুরীর 'গগনরাম ছুটছে' গল্প শহরতলীর নিম্নমধ্যবিত্ত কীভাবে

ঘটনাচক্রে মুনাফার শিকার হয়, তারই আপাত-কৌতুক প্রচ্ছন্ন দুঃখময় বৃত্তান্ত। কাপড় বেচে টাকা দিতে হয় মহাজনকে। নিম্নমধ্যবিত্ত ব্রজলাল তা দিতে পারে না, কেননা ন্যূনতম ব্যয়ের তুলনায় আয় কম। ছেলেকে বলে রাখে, পাওনাদার এলে বলে দিতে, বাবা বাড়ি নেই। গল্পের শেষ বাক্যটি তাৎপর্যময় : 'ধাবমান ব্রজলাল পেছন ফিরে দেখল শেঠ গগনরাম তার থেকেও বেশি জোরে ছুটছে তাকে লক্ষ্য করে।'

বারিদবরণ চক্রবর্তীর গল্প যুব-যন্ত্রণার সার্থক শিল্পরূপায়ণ। 'কালপুরুষ', 'আগুনের পাখি' 'অন্য ঠিকানায়' 'উত্তরাধিকার' প্রভৃতি গল্প একালের অস্থির যুবমানসের স্বরূপ সন্ধান।

দীপ্ত তরুণ জোসেফ। উৎসাহে উচ্ছল, পরের দায় বহনে তৎপর, দুঃস্থদের জন্য বারবার রক্ত দিয়েছে। আবার ঘটনাচক্রে সে-ই ট্রেনের রাহাজানিতে অভ্যস্ত। অধ্যাপকের কাছে জোসেফের প্রশ্নে মূল্যবোধের অবক্ষয় আর যুবমানসের অধোগতির জন্য দায়ী কে, তারই উত্তর চাওয়া হয়েছে–

> মানুষের জন্য যখন অকাতরে রক্ত দিতাম তখন আপনি রুখে দাঁড়াতেন। নিজের জন্য যখন রক্ত নিতে চেয়েছি তখনও আপনি রুখে দাঁড়িয়েছেন, পুলিশে দিয়েছেন। কিন্তু দুটোই ছিল আমার জীবন, মানে জীবনের অস্তিত্ব। এক এক সময়ে এক এক রকমের তার চেহারা। ... আমার সবকিছু টুকরো টুকরো করে ভাঙা। ... তাহলে বলুন, পৃথিবীতে আমরা এসেছি কি জন্যে? শিরায় শিরায় রক্তের এই যে উষ্ণস্রোত এ দিয়ে কী করব?

এই সময়ে আমাদের চোখের সামনে পুলিশী অত্যাচার নিত্য ঘটছে। সরকার-বিরোধী আন্দোলনে জড়িত ব্যক্তিমাত্রেই পুলিশী অত্যাচারের সঙ্গে পরিচিত। সত্তরের দশকের শুরুতে এইসব অত্যাচার ঘটেছে। তা নিয়ে গল্প লিখেছেন অনেকেই। নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হাওয়া হাওয়া' তার সফল শিল্পরূপায়ণ। এক 'কিলার' পুলিশ অফিসার ও এক একদা-বিপ্লবী মুখোমুখি হয় বিপ্লব শেষ হওয়ার পরে এক হোটেলে। সেই বিপ্লবী এখন নামকরা সংবাদপত্রের রিপোর্টার। এখন শত্রুতা নেই, তারা এখন পরস্পরের 'দাদা' ও 'ভাই'। গল্পের নির্মোহ সত্যদৃষ্টি পুলিশ অফিসার ও ভূতপূর্ব বিপ্লবী– বর্তমান রিপোর্টারকে একই নিক্তিতে বিচার করে দেখেছে। এ বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন মহাশ্বেতা দেবী, শৈবাল মিত্র, অমর মিত্র, বিপ্লব রায়, জয়ন্ত জোয়ারদার, জ্যোৎস্নাময় ঘোষ।

প্রযুক্তিগত বিস্ময়কর উন্নতি কীভাবে একটা দেশকে বদলে দেয়, তা ইদানীং আমরা চোখের সামনে দেখছি। টিভি, ভিডিও কীভাবে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে বদলে দিচ্ছে, বহুতল বাড়ির পরিবেশ কীভাবে আমাদের

সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তা হয়ে উঠেছে এই সময়ের গল্পের বিষয়বস্তু। তার উদাহরণ পাই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'মানুষ কিম্বা কোলবালিশ' গল্পে, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'নেশা' গল্পে। শেষোক্ত গল্পে বহুতলবাড়ির উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা নির্মম-নিপুণভাবে উন্মোচিত। পাখি আর মিতা, সুব্রত আর ফনী পাল— কতো বিচিত্র নরনারী। দশ-তলা বাড়ির প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের আছে স্বতন্ত্র ইতিকথা। এই ফ্ল্যাটবাড়ির অনেকেই মদ্যপ। চোখের নিচে থলি, ফোলা ফোলা মুখ, ভাসা অস্বচ্ছ সৃষ্টি। আমুদে স্বভাব। সচ্ছলতার একটা পর্যায়ে অপচয়স্পৃহা জাগে, সেই স্পৃহা আরত্তের মধ্যে রাখলে খুব একটা ক্ষতি হয় না কারও।' কিন্তু ক্ষতি একটা হয়— তা হল ব্যক্তিচরিত্রের সমূহ বিনাশ, মূল্যবোধের বিসর্জন। সুব্রত-মিতা-পাখিকে নিয়ে এই রকম একটি কাহিনী এখানে রূপায়িত। ব্যর্থতাবোধ ও আত্মপ্রতারণার নগ্ন নির্মম উন্মোচন।

এই সময়ের বাংলা গল্প লেখকরা সমাজ-সচেতন, রাজনীতি সচেতন, সামাজিক ছক ও শৃঙ্খলা সচেতন। তার প্রমাণ এখানকার গল্পে হামেশাই পাওয়া যা। সৈকত রক্ষিতের 'চূর্ণলাও বাবু', নলিনী বেরার 'ঝুমকা', ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'তাড়ারসি', অনিল ঘড়াইর 'মুগনি পাথর' তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এ ধরনের গল্পে সাফল্য পেয়েছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি নন্দী, দেবেশ রায়, কানাই কুণ্ডু।

এ ধরনের একটি মাত্র গল্পের উল্লেখ করে প্রসঙ্গে ছেদ টানি। আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাজরা লসকরের যাত্রাসঙ্গী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ('দেশ', ২৩·২·১৯৭২)। হাজরা লসকর গো-হাটা থেকে একটি বলদ কিনে আষাঢ়ের শেষবিকেলে বাড়ি মুখো হাঁটা দিল। সাহেবপুরের মাঠে রাত নামল। এই ত গল্প। একটি চাষী আর একটি নতুন কেনা বলদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কয়েক ঘন্টায় গড়ে উঠেছে, শ্যামল সেইটি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন। সেই রাত্তিরেই রওনা দিল হাজরা আর তার বলদ। মাথায় দুখানি শিঙ। কালো রঙের দুটি ফলা মাথায় করে এগোচ্ছে। পেছনে পেছনে একটা মানুষ। সে শুধু মাঝে মাঝে চিড়ু চিড়ু করে। পথের দুধারে এখন কোনো লোক নেই। এই ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নায় পিচের রাস্তাটা সারা দুনিয়া ঘুরে— এখন কেমন সুন্দর— তারই জন্যে একেবারে তাদেরই দেশ-গাঁয়ের দিকে চলে যাচ্ছে। ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যায় হাজরা।'

এখানে হাস্যরসে, করুণ রসে, চাপা ব্রিদুপে, সর্বোপরি ভালবাসায় উন্মোচিত হয়েছে একটি মানুষ আর একটি পশু। এই সময়ের বাংলা ছোটগল্পে এই জীবনমুখিতা প্রাধান্য পেয়েছে। *

---

* এই নিবন্ধ রচনায় নানা লেখকের গল্প ও তৎসম্পর্কিত নানা আলোচনা থেকে উপাদান সাহায্য নিয়েছি। ঋণ স্বীকৃতি : *গল্পগুচ্ছ* পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা ও *পরিচয়* পঁচিশ বছরের সাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতি সংখ্যার বিভিন্ন আলোচনা। এবং বর্তমান লেখকের *কালেরপুত্তলিকা* গ্রন্থ (১৯৮২, ডি· এম· লাইব্রেরী)।